যুগান্তর

শিক্ষার গোড়ার গলদ দূর করতে হবে

প্রকাশ : ২৩ নভেম্বর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

মো. মইনুল ইসলাম

প্রতীকী ছবি

শিক্ষার গুরুত্ব নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত পাঁচটি মৌলিক অধিকারের একটি।

তাছাড়া শিক্ষিত মানুষই উন্নয়নের চাবিকাঠি। আর আমাদের মতো দেশে উন্নয়ন মানেই দারিদ্র্যবিমোচন। জ্ঞানে ও গুণে সমৃদ্ধ মানুষ সভ্যতার সারথিও বটে। দারিদ্র্যবিমোচন এবং সভ্যতার বিকাশে তাই শিক্ষা ক্রান্তিকালীন ভূমিকা পালন করে। এর গুরুত্ব নিয়ে তাই কারও কোনো দ্বিমত নেই।

কিন্তু শিক্ষাকে কীভাবে কার্যকর ও অর্থপূর্ণ করা যায় সেটাই আমাদের বড় সমস্যা। প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি মানুষকে মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাই আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

শিক্ষার ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগটি নিতে হবে রাষ্ট্র তথা সরকারকে। সরকার অবশ্য এ ব্যাপারে অনেকটা উদ্যোগ নিয়েছে, বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেখলেই এটি প্রমাণিত হয়। এখন দেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৩৪ হাজার। এর মধ্যে প্রায় ৬৫ হাজার ৬২৬টি হচ্ছে সরকারি।

প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। প্রাথমিকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৭৩ লাখ, যার মধ্যে ছাত্রীর হার ৫০.৭৫ শতাংশ। এর পরের পর্যায়টি হচ্ছে মাধ্যমিক। এ ক্ষেত্রে স্কুলের সংখ্যা ২০ হাজারের বেশি এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ কোটি ৪৭ হাজারের মতো।

উচ্চ মাধ্যমিকে কলেজের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার এবং ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৪২ লাখ ৭৮ হাজার। উচ্চশিক্ষার জন্য আছে ১৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয়, যার মধ্যে ৪৯টি সরকারি এবং ১০৫টি বেসরকারি।

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি ও মেডিকেল কলেজগুলো প্রকৌশল, কারিগরি ও চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধিকেও গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। সব মিলিয়ে বলা যায়, অন্তত সংখ্যার দিক থেকে দেশে শিক্ষার অগ্রগতি সামান্য নয়, বরং প্রশংসীয়।

২৫ বছর আগেকার চিত্রের সঙ্গে তুলনা করলে একে ব্যাপকই বলা যায়। আরও বেশি হলে ভালো হতো। তবে যতটুকু বেড়েছে তাকে অবহেলা করা যায় না।

এখন এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষার গুণগত মান। সচেতন শিক্ষিত সুধীজনের মতে, দেশে যথাযথ তথা মানসম্মত শিক্ষা হচ্ছে না।

গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রিধারীরা বাস্তবে হায়ার সেকেন্ডারি তথা উচ্চ মাধ্যমিকের সমান জ্ঞানের পরিচয় দিতেও ব্যর্থ হচ্ছে। কিছুদিন আগে বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্টে দেখা গেছে, আমাদের দেশে ১১ বছর বয়সে একটি শিশু যা শেখে, তা বিশ্বমানে সাড়ে চার বছরে শেখার সমান। মানের এ অবস্থা দুঃখজনকভাবে আমাদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষকদের নজরেও পড়ে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যৌথ প্রচেষ্টায় পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া হল শিক্ষা। শিক্ষক পড়াবে বা শেখাবে এবং ছাত্র পড়বে ও শিখবে, এটি শিক্ষার অতি সাধারণ নিয়ম। এটি আবার এর মূল কথাও বটে। আজকাল দেখা যায়, শিক্ষক সাধারণত মনে করেন, তার কাজ হল ছাত্রদের পাস করানো।

আর ছাত্ররা মনে করে, তাদের মূল কাজ হল পরীক্ষা পাস এবং কাম্য সার্টিফিকেট অর্জন করা। পরীক্ষা ও পাস প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় অবশ্যই একটি বড় কাজ। কিন্তু এর ফলে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অবহেলিত বা অবমূল্যায়িত হয়, তা হল শেখা তথা মান অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করা।

এর সঙ্গে শিক্ষকের আরও একটি কাজ হচ্ছে, ছাত্রদের মনে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগ্রত করা। কারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হলেই শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে না। শিক্ষার আধুনিক ধারণা হচ্ছে, এটি একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। সারা জীবনই পড়তে ও শিখতে হয়। তবে ক্ষুদ্র অর্থে বলতে হয়, সারা জীবনই কিছু শিখতে হয়। তা না হলে যুগ বা জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা যায় না।

আমাদের শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি। মাধ্যমিকেও এ হার কম নয়। কিন্তু উভয় পর্যায়ে 'শিখন সংকটটি' (Problem of learning) অত্যন্ত প্রকট, বিশেষ করে, গ্রামাঞ্চলে এবং দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এ সমস্যাটির মাত্রা বেশি। সংখ্যায় ও গুণগত মানে উপযুক্ত শিক্ষক গ্রামের স্কুলগুলোতে খুবই কম।

শহরের স্কুলগুলোতে এর সংখ্যা ও মান অনেকটা উন্নত হলেও দরিদ্র অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের প্রাইভেট পড়াতে সক্ষম হন না। শহরে শিক্ষিত ও সচ্ছল পিতামাতা অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাও পড়াশোনার ব্যাপারে সন্তানদের সহায়তা করতে পারেন বিধায় তারা উপকৃত হয়।

অন্যদিকে শিক্ষকদের একটি বড় অংশই প্রাইভেট পড়ানোয় বেশি উৎসাহী থাকে। তাতে একদিকে শ্রেণিকক্ষের নিয়মিত পড়াশোনা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা যেমন থাকে, তেমনি দরিদ্র পরিবারে সন্তানদের অভিভাবকদের সাহায্যও তেমন পাওয়া যায় না। এ সবকিছু মিলে শিক্ষার মানের হ্রাস ঘটায়।

শিক্ষার মান হ্রাস পাওয়ার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও বিষয়টি আমরা জানি। শিক্ষাগত যোগ্যতায় দুর্বল, তাই সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সম্মানজনক চাকরি পায় না এমন বেকার গ্র্যাজুয়েটদের স্কুল-শিক্ষকতায় যে বেশ ভালো ভিড় আছে তা অনেকেরই জানা।

তদবির, তোষামোদি, স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অথবা স্থানীয় এমপি বা কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে খুশি করে মাধ্যমিক স্কুলে একটি শিক্ষকের পদ জোগাড় করারও বহু দৃষ্টান্ত আছে। এ উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের বিষয়টিই সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। গত ১৪ অক্টোবর 'গণশিক্ষার জন্য প্রচার অভিযান' নামক একটি সংস্থার প্রতিবেদনে দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার একটি হতাশাজনক চিত্র ফুটে উঠেছে।

তাতে দেখা যায়, ৩৭ শতাংশ শিক্ষক শিক্ষাদানের জন্য গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীল। একইভাবে তারা সৃজনশীল প্রশ্ন করতেও অক্ষম। এর কারণ যে তাদের অযোগ্যতা তা সহজেই অনুমেয়। প্রতিবেদনটির মতে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫৫ শতাংশ ইংরেজি ও অঙ্কের শিক্ষক নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত নন।

আসলে বেশিরভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি ও অঙ্কে ডিগ্রিধারী শিক্ষক নেই। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে নেই বললেই চলে। ফলে এ দুটি বিষয়ে অত্যন্ত অপ্রতুল জ্ঞান নিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হচ্ছে। অথচ মানববিদ্যা, সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সব বই-পুস্তক ও জার্নাল পড়তে ও জানতে হলে ইংরেজি ও অঙ্ক জানতে হবে।

বস্তুত, গোড়ায় এ দুর্বলতা নিয়ে প্রতিবছর আমাদের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার পথে যাত্রা করছে। যার ফলে এমএ, এমএসসি ও এমবিএ নামক ডিগ্রিগুলো যথাযথ গুরুত্ব বা সম্মানজনক না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে হালকা বা হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতার ছোট-বড় অনেক কারণ আছে। তবে এর একটি প্রধান কারণ মাধ্যমিকে ইংরেজি ও গণিত শিক্ষায় বিশেষ দুর্বলতা। এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শিক্ষকদের জ্ঞানের দুর্বলতা এবং সংখ্যার স্বল্পতা। এ দুটো বিষয়ে পর্যাপ্তসংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক অবিলম্বে নিয়োগ দেয়া দরকার।

কিন্তু বর্তমান বেতন-ভাতায় উপরোক্ত বিষয়গুলোতে উপযুক্ত শিক্ষক যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে বলে আমাদের ধারণা। আমাদের দেশে শিক্ষকতার পেশা সমাজে অবমূল্যায়িত; শিক্ষক মানে গরিব মাস্টার, যার 'উপরি' রোজগার নেই, নেই ক্ষমতা প্রদর্শন বা বাহাদুরি দেখানোর সুযোগও।

তাই শিক্ষকতায়, বিশেষ করে, মাধ্যমিকে ভালো ফলধারী তরুণরা আসে না। ইংরেজি, অঙ্ক ও বিজ্ঞানে ডিগ্রিধারী তরুণ-তরুণীরা সাধারণত মেধাবী হয়। তারা শিক্ষা বিভাগে, বিশেষ করে, মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষাদানে আগ্রহী হবে সেটা আশা করা যায় না। মাধ্যমিকে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা যেমন অনাকর্ষণীয়, তেমনি পদোন্নতির সুযোগও অতিসীমিত। ১০ম গ্রেডের একজন সহকারী শিক্ষক ১৪-১৫ বছরেও পদোন্নতি পান না।

অথচ তাদের কাছ থেকে দেশ সুষ্ঠু ও মানসম্পন্ন শিক্ষা আশা করে। এ পর্যায়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। বেতন ও পদোন্নতির ব্যাপারে তাদের হতাশা দেখলে বেজায় দুঃখ হয়। এ ধরনের মনোবল নিয়ে তারা উৎসাহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে পড়াবেন এবং কচি কিশোর-কিশোরীদের অনুপ্রাণিত করবেন সেটা আশা করা যায় না।

শিক্ষার সব পর্যায়েই শিক্ষকদের উপযুক্ত ও সম্মানজনক আর্থিক ও অনার্থিক পুরস্কার দিতে হবে। তবে সেটি সবচেয়ে বেশি দরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে, যে পর্যায়ে শিক্ষার ভিত্তি তৈরি হয়। বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে বর্তমানে প্রাথমিকের শিক্ষকরা যে আন্দোলন করছেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গত।

উচ্চ আমলা পর্যায়ে প্রাথমিকের শিক্ষা অকিঞ্চিৎকর হতে পারে; তবে জাতীয় স্বার্থে তাদের গুরুত্ব অনেক বেশি। এরাই দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার মহাযজ্ঞটি পরিচালনা করছেন। তাদের কয়টি টাকা বেশি বেতন দিলে সরকারের বাজেটে তেমন কোনো টান পড়বে বলে মনে হয় না।

একদিকে বলা হয় শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং শিক্ষকরাই মানুষ গড়ার কারিগর, অন্যদিকে তাদের কিছু বেতন বৃদ্ধি করলে জাতীয় বাজেটে টানাটানি পড়ে যায়- এ ধরনের দ্বিমুখী আচরণ শিক্ষা তথা একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সহায়ক হতে পারে না। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মতে, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে জিডিপির ৬ শতাংশ বিনিয়োগ করা এবং জাতীয় বাজেটে ২০ শতাংশ বরাদ্দ থাকা দরকার।

অথচ বাস্তবে, জানামতে, আমাদের দেশে জিডিপির ২ দশমিক ৫ শতাংশ বিনিয়োগ হয় শিক্ষা খাতে। আর এ খাতে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ থাকে ১৪-১৫ শতাংশ। শিক্ষায় কম ব্যয় করে, বিশেষ করে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষকদের যথাযথ আর্থিক ও অনার্থিক প্রণোদনা এবং প্রেষণা না দিলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারবে না। গোড়ায় গলদগ্রস্ত একটি ব্যবস্থা থেকে পর্যাপ্ত দক্ষ মানবসম্পদ আশা করা যায় না।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে- It is man who gives meaning to everything, অর্থাৎ মানুষই সবকিছুকে অর্থপূর্ণ করে। সেই মানুষ হল শিক্ষাপ্রাপ্ত বা শিক্ষিত মানুষ। এ মানুষই উন্নয়নের মহানায়ক এবং সভ্যতার রথচালক।

মো. মইনুল ইসলাম : সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।